ইমাম মুসলিম র.

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

http://islaminonesite.wordpress.com

ইমাম মুসলিম (র)

ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রকাশকের কথা

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীসশাস্ত্র বিকাশের সুযোগ ঘটেনি। তবে তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) হাদীস মুখস্থ করে রাখেন এবং লেখাসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীকালে তা যে সকল হাদীসবেত্তার অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের কারণে 'সিহাহ সিত্তাহ' রূপে ও অন্যান্য শিরোনামে আজ আমাদের পর্যন্ত এসেছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম (র) অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হুসাইন মুসলিম, লকব— আসাকিরুদ্দীন। জন্ম হিজরী ২০৬ সনে ইরানের খুরাসান প্রদেশের অন্তর্গত নিশাপুরে। তাঁর পিতার নাম হাজ্জাজ। 'কুশাইর' নামক খান্দানে তাঁর জন্ম বলে তাঁকে 'আল-কুশায়রী'ও বলা হয়। অল্প বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি আজীবন রাসূল (সা)-এর রেখে যাওয়া ইসলামী আইন ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস— হাদীসশাস্ত্রের সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে সাধনা করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান রচিত ইমাম মুসলিম (র)-এর এ জীবনালেখ্য 'ইমাম মুসলিম (র)' শীর্ষক পুস্তকটি ব্যাপক পাঠক-প্রিয়তা লাভ করায় এর পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

আশা করি, সুধী পাঠকমহলে এটি আগের মতো সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

http://islaminonesite.wordpress.com

উৎসর্গ

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা
আন্তাস সামীউল আলীম।

হাদীস-শাস্ত্রের সাধক প্রখ্যাত আলেম
জনাব মওলানা মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন
সাহেবের নামে।

http://islaminonesite.wordpress.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিভাগের ডঃ মুজীবুর রহমান সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামের মূল উৎস— কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে এক একটি লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধার করে আসছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে স্বল্পসঙ্গী পথিক বলা চলে। আমাদের এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ ইসলামের মূল বুনিয়াদ কুরআনুল করীম ও হাদীসশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। মরহুম মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখ সুধী গবেষণার যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন, তা আজ শূন্য বললেই চলে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে সত্য, তবে তার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। আরও ব্যাপক না হলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়ার বাসনা বৃথা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমরা এতদিন ইসলাম ও মুসলিমের মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখিনি। মুসলিমদের ইতিহাসই ইসলামের ইতিহাস বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে। অথচ খুলাফায়ে-রাশেদীনের পরে মুসলিম জীবন ইসলাম থেকে কত পৃথক হয়ে পড়েছে ! সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস উদ্ধার করা এখন আমাদের পক্ষে আশু কর্তব্য, তা' না হলে মুসলিমের বিকৃত জীবনকে অপর ধর্মাবলম্বী লোকেরা যে ইসলামেরই জীবন্ত রূপ বলে ভুল বুঝবে তার একান্ত সম্ভাবনা ও অবকাশ রয়ে গেছে।

ইসলামের ইতিহাস প্রণয়ন করতে হলে কুরআনুল করীমের বিভিন্ন সূরার নাযিল হওয়ার ইতিহাস, হযরত রাসূল আকরাম (সা)-এর হাদীসের উৎপত্তি ও সংগ্রহ প্রভৃতির ইতিহাস এবং মুহাদ্দিসগণের জীবন কথা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সত্যিকার ইসলামপন্থী মানুষের জীবন-সাধনার ধারাকে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া যাঁরা সত্যিকার ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার নানা দেশে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবনকথাও প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

ডঃ মুজীবুর রহমান সাহেব ইতিপূর্বে ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম ও ডঃ হিলালীর "Islamic Attitude Towards Non-Muslim" নামক ইংরেজি বইখানা বেশ সুন্দরভাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এবারে তিনি ইমাম মুসলিম (র) নিয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

পাঠক-পাঠিকার খিদমতে উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁর পরবর্তী পরিবেশন হবে 'কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা', 'হযরত আবুজর গিফারীর জীবন কথা' ও 'আল্লামা যামাখশারী'। এভাবে আমাদের লুপ্ত রত্নের উদ্ধারে তিনি আত্মনিয়োগ করে আমাদের সমাজের যে খিদমত করছেন, তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমি সর্বান্তকরণে তাঁর পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মুহাম্মদ আজরফ
অধ্যক্ষ
আবুজর গিফারী মহাবিদ্যালয়
ঢাকা, ১৭-৪-৭৫

http://islaminonesite.wordpress.com

লেখকের কথা

রাসূলে-আকরাম (সা) যেমন গোটা মানব জাতির জন্য একটা চিরন্তন, সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়তও ঠিক তেমনি সর্বকালের, সমগ্র মানবতার ঐহিক ও পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ লাভের একমাত্র নিয়ামক, বিশ্বমানবের জন্য এক অখণ্ড চূড়ান্ত জীবন-বিধান। সময় ও স্থানের পরিধি বা যুগকালের আবর্তন-বিবর্তন একে কোনদিনই স্পর্শ করতে বা এর ত্রি-সীমানায় পদার্পণ করতে পারে না! বিশ্বনবী (সা)-এর এই শাশ্বত অনুপম আদর্শ জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রেই অনুসরণীয়। তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন যেমন আমাদের জন্য তথা সকল যুগের মানুষের জন্য একটা অক্ষয় আদর্শ এবং অনন্ত কল্যাণ পথের দিশারী, তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনের সমন্বয়ে গঠিত হাদীস বা সুন্নাহ্ও ঠিক তেমনি এক চির উজ্জ্বল দীপ-শিখা। এর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে ইসলামী জীবন-বিধানের সর্বকালীন সুউচ্চ সৌধমালা।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কুরআন মজীদ যেমন অক্ষুণ্ন, অটুট ও অপরিবর্তনীয়রূপে সংরক্ষিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বা সুন্নাহ্ও ঠিক অনুরূপভাবে ধ্বংসের হাত থেকে, অবলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে সুরক্ষিত।

এ কথা সত্য যে, ধর্মনীতি তথা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম জীবন-বিধান এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সঠিক সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য হাদীসশাস্ত্রই হচ্ছে প্রধান বাহন ও অবলম্বন। হাদীসের মূল্য ও গুরুত্ব তাই অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হিসেবে তাই পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। সুতরাং একাধারে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা, রাসূলে করীম (সা)-এর চিরন্তন জীবনাদর্শ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলেখ্য এবং এক কথায় শরীয়তে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে এই হাদীস বা সুন্নাহ্। বস্তুত হাদীস ছাড়া কুরআনকে সম্যক অনুধাবন করা এবং ইসলামের রূপরেখা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা একেবারেই কল্পনাতীত। এই হাদীসের মাধ্যমেই আঁ হযরত (সা)-এর রাষ্ট্রগত, সমাজগত, ধর্মগত ও পূত জীবনের খুঁটিনাটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাবলী আমাদের সামনে এসে ধরা দেয়। আমরা তখন জানতে পারি, ইসলামের সেই প্রাথমিক সোনালী যুগের আদি ইতিহাস, মুসলিম জীবন-বিধানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং কুরআনী মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকরী পন্থা। সুতরাং কুরআন ইসলামের আলোকস্তম্ভ আর হাদীস তার বিচ্ছুরিত জ্যোতির দিগন্তপ্রসারী প্লাবন।

http://islaminonesite.wordpress.com

আলোহীন প্রদীপ যেমন মূল্যহীন, হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনও তেমনি নিরর্থক। বস্তুত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে হাদীস সম্বন্ধীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান আহরণ এক অমূল্য ও অপরিহার্য সম্পদ।

আগেই বলেছি, নবী মুস্তফা (সা)-এর মুখনিঃসৃত উপদেশমূলক অমিয় বাণী, কর্ম এবং এ জাতীয় অন্যের কাজকর্ম ও কথার প্রতি তাঁর সমর্থন, অনুমোদন ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদীস। এই হাদীসের ভাববাণী তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকেই প্রাপ্ত হতেন 'ইলহামে খাফী' বা 'গাইর-মাতলু ওয়াহীর' মাধ্যমে।[১]

নবুয়ত প্রাপ্তির পর আঁ হযরত (সা)-এর গোটা জীবনটাকেই আল-কুরআনের আদর্শের মূর্তিমান বাস্তব রূপায়ণ বলা চলে। এক কথায় কুরআনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আদেশ-নিষেধকে জীবন্তরূপে তুলে ধরলে যে আকৃতি দাঁড়ায়, সেটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোটা জীবন। তাঁর কর্মই ছিল কুরআনের শিক্ষার বাস্তব রূপ। তাই তাঁর প্রতিটি কার্য ও বচনামৃতকে অতি আগ্রহ ভরে অক্ষরে অক্ষরে পালন ও মুখস্থ করে রেখেছিলেন সেই সোনালী যুগের সাহাবায়ে-কিরাম বা ভক্ত অনুসারীরা। বস্তুত একটা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পরে ইসলামের ভক্ত, অনুরক্ত, অনুসারীরা প্রজ্ঞা ও প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে এই হাদীসটি থেকে যতোটুকু প্রাণরসের সন্ধান পেয়েছিলেন তার তুলনা সত্যিই কোথাও মেলে না। তদানীন্তন কালে সাহাবীদের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যই একটা অলৌকিক ব্যাপার, একটা ঐতিহাসিক বিস্ময়। তাই পবিত্র হাদীসকেও তাঁরা এই স্মৃতির মণিকোঠায় পরম আদরে সংরক্ষিত রেখেছিলেন ঠিক যেন যক্ষের ধনের মতোই। এ ব্যাপারে তাঁদের স্বভাবজাত স্মরণশক্তিই ছিল প্রধান সহায়ক। লক্ষ লক্ষ মুসলিম সন্তান হাদীসের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণকে জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে এ পথে তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন অকাতরে, অম্লান বদনে। আসল রাবী বা বর্ণনাকারীর মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস শোনার সংকল্প নিয়ে মদীনা থেকে সেই সুদূর দামেশকে পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করার কষ্টকে তাঁরা অম্লান বদনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হওয়ার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবদ্দশায় আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী পর্যায়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করতেন। তবুও ভুলে যাওয়ার ভয়ে তাঁর পরোক্ষ ইংগিতক্রমে কেউ কেউ তা লিখেও রাখতেন সযত্নে। সত্যিকার অর্থে রাসূলুল্লাহ্র ইন্তিকালের পর হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের ব্যাপক অভিযান শুরু হয় সকলের ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টায়।

---

১. প্রচ্ছন্ন বা আবৃত্তিবিহীন ঐশী বাণী যা সর্বসাধারণের অজ্ঞাত।

http://islaminonesite.wordpress.com

দূর-দূরান্তের দেশ-বিদেশে যিনি যে হাদীস জানতেন, তিনি তা নিজের অপরিহার্য পবিত্র দায়িত্ব ও আশু কর্তব্য মনে করে লিপিবদ্ধ অবস্থায় কেন্দ্রস্থলে এনে জমা দিতেন। এভাবে দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবন যাত্রা এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বহু অজ্ঞাত হাদীস সাধারণের দৃষ্টিপথে এসে ধরা দেয়। বস্তুত তখনকার দিনে মুসলিম মনীষীদের প্রাণে ধর্মপ্রবণতা ছিল অতি প্রকট। তাই তাঁরা যে কোনও একটা অজ্ঞাত নতুন হাদীসের সন্ধান সূত্র ধরে দূর-দূরান্তের ও পথ-প্রান্তরের সমস্ত কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নতুন স্থানে গিয়ে উপনীত হতেন। এভাবে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এত বেশি হাদীস সংগৃহীত হয় যে, হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান-পিপাসুরা নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে বিপুল সংখ্যায় তাঁদের আবাসভূমিকে হাদীস অধ্যয়নের এক একটা নামকরা শিক্ষায়তনে পরিণত করে তোলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি স্থানে হাদীস আলোচনার এক একটি প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত হয়, আর সেসব কেন্দ্রে অসংখ্য ও অগণিত হাদীস-অনুসন্ধিৎসু এসে ভিড় জমাতে থাকেন। সেই সঙ্গে সংগৃহীত হতে থাকে এই অনুসন্ধিৎসুদের লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি আর চলতে থাকে তার যাচাই-বাছাই এবং সত্যতা প্রমাণের কার্যক্রম।

সাধকশ্রেষ্ঠ হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের (মৃঃ ১০১ হিজরী, ২৫শে রজব) নির্দেশক্রমে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রবাহ আরও দুর্বার গতিতে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে এবং আবু বকর ইবনু হাজম (মৃঃ ১১৭ হিঃ) ও ইমাম যুহ্‌রী (মৃঃ ১২৪ হিঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের জীবনভরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে হাদীসশাস্ত্রের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তার দুর্জয় সত্তা নিয়ে আজও আমাদের সামনে অবিকৃত অবস্থায় সগৌরবে বিরাজমান। সে যুগে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু কিছু মনগড়া হাদীস রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলো থেকে বিশুদ্ধ হাদীসের ছাঁটাইয়ের প্রাক্কালে মুহাদ্দিসগণ যে একাগ্রতা, অনমনীয়তা ও অবিচল নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তার সামনে এই মনগড়া জাল হাদীসের কৃত্রিম প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে পশ্চিমা পণ্ডিতদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত হয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানও আজ সন্দিহান চিত্তে রাসূল (সা)-এর হাদীসকে ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। কিন্তু মুসলিম মনীষীদের তো কথাই নেই, অমুসলিম পাশ্চাত্য মনীষীরাও এ উৎসকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে সেই হাদীস বিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছেন।

তাই সংগতভাবে আশা করা যায়, আজকের দিনে মানুষের মানসক্ষেত্রের দ্বিধা-সংশয়, সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে এ জাতীয় হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থমালা অন্তত একটা ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকার কাজ করবে সন্দেহ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

নবী মুস্তাফা (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ সাধক, সেবক ও সংগ্রাহক সংকলক হিসেবে এই মুহাদ্দিসগণ বিশ্ব-মুসলিম জাহানেরও যথার্থ মঙ্গল ও অনন্ত কল্যাণ সাধন দ্বারা গোটা মুসলিম জাতিকে এক অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা সাধারণ্যের লোভ, লালসা, মোহ ও ভোগ-লিপসার ঊর্ধ্বে থেকে বিরোধী দলের শত অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে স্বীয় চরিত্রবল ও আদর্শ দ্বারা বিশ্ব-মুসলিমের স্মৃতিপটে অক্ষয় রেখা অংকন করতে সমর্থ হন।

সকল যুগে এমন কি এই বস্তু-শাসিত দর্শন ও সংশয়ের যুগেও দুনিয়ার মানুষ এই কালজয়ী মহাপুরুষ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হৃদয়, মানস এবং জীবনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা, শিক্ষা ও সান্ত্বনার পাথেয় খুঁজে পেয়েছে। এর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে এঁদের মহত্ত্বের বাস্তব দিকের প্রতি মানুষের শুভদৃষ্টি আপনা-আপনিই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এহেন কীর্তিমান সাধক পুরুষদের পূত জীবন কথা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে কার না ইচ্ছা হয়!

আরবী, ফারসি, উর্দুতে এই পুণ্যশ্লোক মুহাদ্দিসগণের বহু গবেষণামূলক জীবন কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এ প্রসঙ্গে ভয়াবহ দীনতা ও শূন্যতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

কতকটা সুধী পাঠকবর্গের এই দুর্বার প্রচ্ছন্ন চাহিদা পুরণ আর কতকটা বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের অপ্রতুলতা বিদূরণ ও অভাব মোচনের অভিপ্রায় নিয়ে আমি নিজের স্বল্প বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। আমার এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গত বিচার-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়ন চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ পাঠকরাই করবেন। মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর তো তাঁদের হাতেই।

আমার এ লেখাগুলো বেশ কিছুদিন আগে ঢাকার সাপ্তাহিক 'আরাফাত' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'নেদায়ে ইসলামের' পৃষ্ঠাসমূহে বের হয়। তখন এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের কোনও পরিকল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু পরে বন্ধু-বান্ধব, শিষ্য-শাগরিদ ও শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের পরামর্শই আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন গতবারে দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে আমার এক প্রবাসী বন্ধু কলকাতার প্রকাশক। আজ বহুদিন পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম সাহেবের প্রেরণা ও সৌজন্যে বহির্জগতের আলো-বাতাসের সঙ্গে এগুলো পরিচিত করতে পেরে তাঁর কাছে আমার নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অবশ্য ইতিপূর্বে 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' নাম দিয়েও একত্রে প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। নানা

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে বইখানিকে আমি মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে ও সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রিয় পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে ধরতে না পারায় মর্মে মর্মে পীড়া অনুভব করছি। তবুও যদি সুধী পাঠকবর্গ আমার এ প্রচেষ্টা থেকে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হতে পারেন তাহলে আমি শ্রম সার্থক মনে করব।

কলেবর বর্ধিত হওয়ার ভয়ে এবং আরো কতগুলো অপরিহার্য কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা এবারের মতো স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছি। আগামী দিনে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলোর যথাযোগ্য সংযোজন, পরিবেশন এবং অন্যান্য ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের বাসনা অন্তরে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রইলাম। সহৃদয় ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দের খিদমতে সনির্বন্ধ নিবেদন, যেন তাঁরা আগামীতে এই ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে এবং বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, উপস্থাপনা ও অন্যান্য উন্নতি করে যে কোনও কার্যকরী প্রস্তাব ও পরামর্শ দিতে আদৌ কুণ্ঠবোধ না করেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের এ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে এবং আমি আজীবন পরম কৃতজ্ঞতার সাথে এ ঋণের কথা স্মরণ করবো।

সিহাহ সিত্তার এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের জীবনীর পরিসমাপ্তি এখানেই নয়। এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে শুধুমাত্র প্রতিথযশা কালজয়ী হাদীসবেত্তা ইমাম মুসলিমের কথা। অনুরূপভাবে 'সিহাহ সিত্তার' বাকি হাদীসবিদ এবং অবশিষ্টদের আলোচনাসহ আলাদাভাবে পুস্তক রচনার কাজ চলছে, দু'একটি প্রকাশিতও হয়েছে।

এ পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা দান করেছেন। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের ঋণ স্বীকার করে তাঁদের মহত্ত্বকে খাটো করতে চাই না। দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক তাঁদের ইহ্সান কবুল করুন এবং প্রত্যেককে জাযায়ে-খায়ের দান করুন। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
এম. এ (রাজশাহী) এম. এম (ঢাকা)
এম. ও. এল. (লাহোর)
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইমাম মুসলিম (র)

প্রায় ধ্বংস্তূপে পরিণত সেই চল্লিশ হাজার লোকের আবাসভূমি নিশাপুর, যার নিকৃষ্ট চটকদার পারস্য গালিচা নিয়ে বৃদ্ধ ইরানী দোকানদার আজও ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে ঝিমায় ফুটপাতের সেই অপরিসর কক্ষে। পাক-ভারতের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ইরানের খুরাসান প্রদেশের অন্তর্গত অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ শহর এই নিশাপুর। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সভ্যতা ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে এ শহর এককালে ইতিহাসের পাতায় বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তাতার ও মোঙ্গল অভিশাপের করাল কালো ছায়া খুরাসান তথা নিশাপুরের বুকে নেমে আসতে সক্ষম হয়নি। জমির উর্বরা শক্তি তখনও ছিল প্রচুর। সবুজ শ্যামলিমার উপর সাদা রঙের উল্লসিত ঢেউখেলা বসন্ত বাতাসের ছোঁয়া লাগা উৎকৃষ্টতম আঁশযুক্ত তুলার গাছে ছেয়ে যেতো খেত-খামারগুলো। এই তুলা দিয়ে নিশাপুরের সুদক্ষ কারিগর ও তন্তুবায়রা তৈরি করতো অগণিত মহামূল্য শাল আর গালিচা যার জন্য ইরান তখন বিশ্ববাজারে বুক ফুলিয়ে গর্ব করার ন্যায্য অধিকার রাখতো। তখনকার দিনে এই নিশাপুর ছিল ঠিক যেন কোনও বিরাট ধনকুবেরের বিলাসী পাটরাণী। সর্বাঙ্গে তার ঝলমল করতো বিচিত্র কারুকার্যময় অলংকার আর অঢেল প্রাচুর্যের সুস্পষ্ট ছাপ। ধনে, জনে, মানে, সম্মানে, প্রভাব প্রতিপত্তিতে নিশাপুর তখন যেন উপচে পড়তো আর তার অনন্ত সৌন্দর্যরাশি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতো।

সে যুগে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নগরীর মধ্যে নিশাপুর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলো। অদ্ভুত অপূর্ব ছিল তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সবুজ প্রান্তরের কোল ছুঁয়ে যেতো নিশাপুরের অপসৃয়মান পর্বতমালা। ভোরের সূর্যের সোনালী আলো ঠিকরে পড়তো তুষারাচ্ছন্ন পর্বতচূড়ায় বর্ণচ্ছটার রংধনু এঁকে। সেই সূর্য মৌন, নিথর শান্ত সমাহিত নিশাপুরের পূর্ব গগনে আজও উঁকি দেয়; আজও সেই রাঙা রোদ চুম্বন দিয়ে যায় তুষার-মৌলি পাহাড় শ্রেণীকে। এখানকার প্রাকৃতিক পটভূমি আজও ঠিক তেমনিই রয়েছে। নেই শুধু সেই অতি সুন্দর সোনালী সাধের নিশাপুর, তার অতীত দিনের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যময় কাহিনী আজকের দিনে একটা অবাস্তব অলীক স্বপ্ন বলেই প্রতীয়মান হয়। আর মনে হয় সব যেন কেমন একটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তৎকালীন

http://islaminonesite.wordpress.com

নিশাপুর ও আজকের নিশাপুরের মধ্যে কতো পার্থক্য! মানে আকাশ এবং পাতালের পার্থক্য, রাত্রি এবং দিনের তফাৎ তথা সপ্তসিন্ধুর ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।

নিশাপুরে যখন ঐশ্বর্যের বান ডেকেছিল তখন এই মাটিতেই একদিন জন্ম নিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি উমর খৈয়াম (মৃত্যু ঃ ১১২৩ খৃঃ)। এছাড়া ওস্তাদ আবু বাকর কোরাক (মৃত্যু ঃ ৪০৬ হিঃ– ১০১৫ খৃঃ), আবু ইসহাক ইসফেরায়নী (মৃত্যু ঃ ৪১৮ হিঃ– ১০২৭ খৃঃ), ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল জুয়াইনী (মৃত্যু ঃ ৪৭৮ হিঃ – ১০৫৫ খৃঃ) প্রমুখ মহামনীষীর কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আরও দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একজন হচ্ছেন খাজা নিযামুল মূলক তুসী, যিনি পরবর্তীকালে সেলজুক সম্রাট আল্‌ফ আরসালান ও মালিক শাহ সেলজুকীর উযির হয়েছিলেন, অপরজন হাসান বিন সাব্বাহ, যাঁর শানিত ছুরিকাকে সমগ্র এশিয়ার সম্রাটরা সব সময় যমের ন্যায় ভয় করতেন আর যাঁকে ক্রুসেডের খৃস্টানরা আখ্যা দিয়েছিল, "Old man of the mountain".[১]

সে যাই হোক, আজকের এই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এঁদেরকে নিয়ে আলোচনা করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমি যাঁর জীবনকথা ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে কলম ধরতে যাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন এঁদেরও সহস্রাধিক বছর আগের খ্যাতিমান মনীষী মহামতি ইমাম মুসলিম (র)। শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু এই নিশাপুরকে তখন ভৌগোলিক গ্রন্থমালায় 'বাবুল মাশ্‌রিক' বা প্রাচ্যদ্বার হিসেবে উল্লেখ করা হতো।[২] নিশাপুরের এই ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা শ্যামল আবেষ্টনীর মধ্যে নসরাবাদ শহরে হাজ্জাজ নামক একজন প্রখ্যাত মনীষী বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কুশাইর খান্দানের এক উজ্জ্বলতম গৌরব রত্ন। পিতার নাম ছিল মুসলিম আর পিতামহের নাম আরদ বিন্ কুশাদ।

হিজরী ২০৬ সালে (মতান্তরে ২০৩ বা ২০৪ হিঃ) মনীষী হাজ্জাজের ঔরসে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে চাঁদের মতো ফুটফুটে এক পুত্ররত্ন এই নিশাপুরের মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মনীষী হাজ্জাজ স্বীয় পিতার নামানুসারে ছেলের নাম রাখেন মুসলিম। আর এই নামের মনোরম সংযোজন হিসাবে কুনিয়াত বা উপনাম রাখা হলো আবুল হুসাইন এবং লকব আসাকিরুদ্দীন। তাহলে এখন শেজরায়ে-নসব বা বংশ তালিকা দাঁড়ায় এই— আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম, বিন আরদ, বিন কুশাদ আল কুশাইরী বানু হাওয়াবিন। যেহেতু তাঁর খান্দান 'কুশাইর' নামক কাবীলার অন্তর্ভুক্ত

---

১. Mirkhund's History of the Assassins, Calcutta Review No 69 দ্রষ্টব্য।

২. মাসিক তাহ্‌যীবুল-আখলাক, ডঃ ইনআ'মুল হক কাউসার লিখিত 'নিশাপুর ইসলামী উলুম কা মারকায' শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৯৬৮ সাল, মে সংখ্যা, ১৫ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাই তাঁকে কুশাইরী বলা হয়। যা হোক, এই নবাগত শিশু একদিন যে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করবেন এবং ইসলামের পূর্ণ গৌরব ও যশোখ্যাতি দুনিয়ার দিকদিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই যে এই ধরাধাম তাঁর শুভাগমন সূচিত হয়েছে– তার সমস্ত লক্ষণই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল বালক মুসলিমের মাঝে। তাঁর জন্মদিনেই দেশবরেণ্য ইমাম ইদরীস শাফেয়ীর ইন্তেকাল হয়।[১]

অসংখ্য তারকার মধ্যে পূর্ণ চাঁদ যেমন অপূর্ব দীপ্তিতে ভাস্বর, আমাদের ভাবী ইমাম মুসলিমও ছিলেন ঠিক তেমনি বালক সমাজের মধ্যে অনন্য প্রতিভা ও অপূর্ব চরিত্রমাধুর্যের মালিক। অতি শৈশব থেকেই তিনি একজন অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সচ্চরিত্র কোমলমতি বালকরূপে সহপাঠি ও বাল্যসাথীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য কবি মিলটন সত্যই বলেছেন ঃ "The childhood shows the man as morning shows the day" বাল্যকালে ইমাম মুসলিমের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিশাপুরের এক আদর্শ বিদ্যালয়ে। অবশ্য ইতিপূর্বেই তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল মাতাপিতার পবিত্র সন্নিধানে, যে মাতাপিতার প্রতি ইমাম মুসলিমের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। তিনি কখনো তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেন নি। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর।

নিশাপুরের আদর্শ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও অপূর্ব জ্ঞানসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। শুধু তাই নয়, তাফসীর, তারিখে হাদীস শাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে অতি শৈশবেই তিনি উস্তাদমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নিশাপুরের মাদরাসার তখন প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া যুহলী। তাঁর কাছে বালক মুসলিম অনন্যমনে একাগ্রচিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। মুহাদ্দিস যুহলী যখন হাদীস পড়াতেন এবং এ সম্পর্কে ভাষণ দান করতেন, তখন তিনি তন্ময় চিত্তে তা শ্রবণ করতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো কাগজ ও কলম। এই কলম দিয়ে তিনি উস্তাদের মুখনিঃসৃত হাদীস সম্পর্কিত তাক্‌বীরগুলো সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করে ফেলতেন। এই সঙ্গে তিনি অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। হাদীস লেখা শেষ হলে তিনি সহপাঠীদের মজলিসে পুনরালোচনা শুরু করতেন।

আগেই বলেছি, বড় বড় অসংখ্য খ্যাতিমান মহামনীষীর অধ্যুষিত দেশ এই নিশাপুর। একদিন ঠিক যেন জঙ্গলের আগুনের মতোই। এক খোশখবর এ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো যে, মুহাদ্দিসকুল-শিরোমণি মহাত্মা ইমাম বুখারী (মৃত্যু ঃ ২৫৬ হিঃ) নিশাপুরের মাটিতে আগমন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশময় তুমুল

১. তারীখে ইল্‌মে হাদীস, মুফতী আমিরুল ইহসাদ বরকতী ঃ ৫০ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। নিশাপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা— সবাই বিরাট মিছিলে খোশ-আমদেদ জানিয়ে তাঁকে বিপুলভাবে সাদর সম্বর্ধনা জানালো, অতঃপর হাদীসে নব্বীর অধ্যাপনার পবিত্র আসন অলংকৃত করার জন্য দেশবরেণ্য মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলো। এই অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে মুহাদ্দিস-গুরু পবিত্র দরসে হাদীসের আসন অলংকৃত করতে রাযী হলেন। খবর শুনে নিশাপুর-খুরাসানের দিগদিগন্ত থেকে ইল্‌মে হাদীসের অগণিত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র দলে দলে হাদীস ক্লাসে শরীক হতে লাগলো। ইমাম-মুসলিমও এই সোনালী সুযোগকে হেলায় হারিয়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তাই অনতিবিলম্বে তিনি পবিত্র হাদীসের এই পাঠচক্রে যোগদান করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এভাবে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলী নামক স্বনামধন্য মুহাদ্দিসদ্বয়ের পবিত্র খিদমতে হাদীস শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, এই সুবর্ণ সুযোগ খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। কারণ উভয় মুহাদ্দিসের মাঝে খালকে কুরআনের (কুরআন সৃষ্টি) মাসআলা নিয়ে অতি সত্ত্বর মতবিরোধ দেখা দিল।

অনেকেই বলেন যে, ইমাম সুহলী নাকি জানতে চেয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট। এর উত্তরে ইমাম বুখারী জানিয়েছিলেন যে, মৌলিক কুরআন সনাতন ও অসৃষ্ট; কিন্তু শাব্দিক কুরআন সৃষ্ট অ-সনাতন। একথা শুনে ইমাম যুহলীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং বজ্রস্বরে গর্জে উঠে বলেন,— "যারা সনাতন কুরআনকে সৃষ্ট বলে ধারণা করে তাদের শিক্ষাগারে দার্স দেওয়ার কোনই অধিকার নাই।" সুতরাং পরক্ষণেই ইমাম বুখারীকে নিশাপুর থেকে বিদায় নিতে হয়।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু এরূপ নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, ইমাম বুখারী ২৫০ হিজরীতে যখন নিশাপুরের মাটিতে পা দিয়ে হাদীসের দার্স দিতে শুরু করলেন, তখন অতি অল্প দিনেই শ্রোতাদের কাছ থেকে তিনি এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন যে, হাফেজ যুহলীর পাঠচক্র অতি সত্বর জনবিরল হয়ে পড়লো। এতে করে ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই হাদীস জুহলী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অপবাদ এবং গোপন ষড়যন্ত্রের অবতারণা করেছিলেন।[১] অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদীসবেত্তা ইমাম বুখারী স্বয়ং এই অপবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীয় আকীদার কথা প্রকাশ করেন। ইমাম বুখারী স্বয়ং তাঁর চিন্তাধারা, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেন ঃ

আল-ঈমানু কাওলুন ওয়া আমালুন ওয়াযিদু ওয়া ইয়ানকুসু, ওয়াল কুরআনু কালামুল্লাহ গাইরু মাখলুকিন, ওয়া আফযালু আসহাবি রাসূলিল্লাহি (সা) আবু বাকরিন

১. দেখুন হাফিয যুহরীর মীযানুল-ঈ'তিদাল, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সুম্মা উমারু সুম্মা উসমানু সুম্মা আলীউন, আলা হাযা হাইয়িতু ওয়া আলাইহি আমুতি ওয়া আলাইহি উবয়াসু ইনশাআল্লাহ'।

অর্থাৎ, ঈমান হচ্ছে উক্তি ও আচরণের নাম, তাহা যেমন বর্ধিত হয় তেমনি হ্রাসপ্রাপ্তও হয়ে থাকে এবং কুরআন আল্লাহ্র শাশ্বত বাণী এবং সৃষ্ট বস্তুসমূহের পর্যায়ভুক্ত নয়। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচরমণ্ডলীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত আবূ বকর, অতঃপর উমর তারপর উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (ইমাম বুখারী বলেন) এই মতবাদ ও আকীদার উপর আমি বেঁচে রয়েছি এবং এরই উপর আমি মৃত্যুবরণ করবো আর আল্লাহ্ চাহে তো এই মতবাদ নিয়েই পুনঃরুত্থিত হবো।

হাফিয মুহাম্মদ বিন নসর আল মিরওয়াযী (মৃত্যু ঃ ২৯৪ হিঃ) ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ঃ

"মান যায়ামা আন্নী কুলতু লাফযী বিল কুরআনে মাখলুকুন ফাহুয়া কাযযাবুন ফা ইন্নী লাম আকুলহু।"

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আমি কুরআনকে শাব্দিকভাবে সৃষ্ট বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করি, সে মিথ্যাবাদী। আমি কস্মিনকালেও এরূপ কথা বলি নাই।"[১]

আসলে কতকগুলো নীচমনা নীচাশয় কুচক্রী ব্যক্তি তাদের হীন স্বার্থের খাতিরে স্বীয় দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাতে গিয়ে এই কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। আর ইমাম বুখারীর আকীদা ও মিথ্যা অলীক অপবাদের জাল বুনিয়ে স্বল্পশিক্ষিত জনসধারণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে বুখারার গভর্নর খালিদ ইব্ন আহমদও এই মিথা দোষারোপের ফানুস উড়িয়ে দেশময় তুমুল অশান্তি ধূমায়িত ও তীব্র আন্দোলনের লেলিহান অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দান করে। নতুবা ইমাম বুখারীর মতো খ্যাতনামা মহাবিদ্বান তো দূরের কথা, আহলে সুন্নাত আল-জামায়াতের কোনও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও পাক কুরআনকে শাব্দিকভাবে সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করতে পারে না।

একথা সত্য যে, দ্বিতীয় শতক হিজরীর প্রান্তভাগে ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি ও আকায়িদ নিয়ে আলিমদের মাঝে বেশ একটা মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। মুতাযিলা দর্শনই ছিল এই মতপার্থক্যের মূল উৎস। এরা ধর্ম শাস্ত্রকে সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের মানদণ্ডে যাচাই করতে গিয়ে সুন্নাতে রাসূল ও আসারে সালফদের অনুসরণকে

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ঃ হাফিজ ইব্ন হাজারকৃত ফতহুল বারীর উপক্রমণিকা, ৪৯১ ও ৪৯২ পৃষ্ঠা এবং তাঁর তাহযীবুত তাহযীব; ৯ম খণ্ড, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

পূর্ণমাত্রায় বর্জন করেছিলেন। এমন কি আল্লাহর সর্বময় একত্বের দোহাই দিয়ে কুরআনের চিরন্তনত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এমন কতকগুলো আকায়িদ ও ধর্মবিশ্বাসের ধারা উদ্ভাবন করেন, যাহা মুসলমানদের আকায়িদ থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলদা এবং মুহাদ্দিসগণের মতবাদের বিপরীত। প্রথমে এ বীজ অংকুরিত হয় বসরা নগরীতে। অতঃপর এর প্রবল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাভিঘাত ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীর মর্মমূলে গিয়ে আছাড় খেতে থাকে।

এ সময়ে হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মামুন, আমীনের তাজা রক্তে হাত রাঙিয়ে বাগদাদের খিলাফত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তার চারপাশে ঘটেছিল পারসিক শক্তি ও কৃষ্টির সমাবেশ। তিনি নিজেই ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিলেন মার্ভ নগরে। তাই মার্ভ ছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোরের ক্রীড়াভূমি। খিলাফতের গদীতে সমাসীন হয়ে তিনি ইসলাম জগতের রাজধানী এই মার্ভ শহরেই স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন সাধ বাস্তবে পরিণত হতে নানারূপ প্রতিবন্ধক ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বাগদাদে এসে সর্বপ্রথম তিনি বিভিন্ন সুধী মজলিস কায়েম করলেন। এতে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা দেশ, কাল, পাত্র ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্বাধীন নিরপেক্ষ আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিতেন। এতে বিশেষভাবে ঐ সমস্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ নেওয়া হতো, যেগুলো সম্পর্কে সুধী-সজ্জনরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এমন কি আল্লাহ পাকের গুণাবলী কাদীম, সনাতন না পরিবর্তনশীল এবং পবিত্র কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট— এ নিয়েও সেই সুধী সভায় নরম-গরম আলোচনা ও বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে। অবশেষে তা চরমে এসে পৌঁছে এবং মুহাদ্দিসীনে-কিরাম মু'তাযিলাদের মাঝে বেশ একটা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এদিকে ব্যক্তিগতভাবে মামুনের অনৈসলামিক দার্শনিক অভিরুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি বাগদাদে জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপ্লবের সৃষ্টি করে। তাই আহলে-হাদীস ও আহলে-সুন্নাতগণের পরিবর্তে তখন মু'তাযিলাদেরই প্রতিপত্তি ও প্রভাব-প্রাধান্য উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। মামুন নিজেই মু'তাযিলাদের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং ৮৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে মু'তাযিলাদের সমর্থনে রাজাজ্ঞা প্রচার করলেন। এই ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করার ফলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (মৃত্য ঃ ২৪১ হিঃ) খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং বেত্রাঘাত দ্বারা অতি নৃশংস ও নির্মমভাবে প্রহৃত ও নিপীড়িত হন।

একথা সত্য যে, রাজদরবারের ভিতরে ও বাইরে মু'তাযিলারাই সর্বেসর্বা হয়ে খলীফা মামুনের কাছে সর্ব বিষয়ে তাদের দাবী-দাওয়া, প্রতিপাদন ভঙ্গি ও সমস্যার সমাধান অগ্রগণ্য হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে রাজকীয় শক্তি দ্বারা তিনি আহলে-সুন্নাতদের উপর অবাধ অত্যাচার শুরু করেন; কিন্তু এই অবাধ অত্যাচার ও নিপীড়ন চিরকালই

http://islaminonesite.wordpress.com

মানুষের অভ্যন্তরীণ লুপ্ত শক্তির উন্মেষ সাধনে সহায়তা করে থাকে। তাই এক্ষেত্রেও এই চিরন্তন সত্যের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মু'তাযিলা ফিতনার এক প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত গিয়ে নিশাপুরের সীমান্ত তথা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া যুহলীর দর্‌সগাহে উপনীত হয়। একদিন আহম্মদ বিন সাহালামাহ নামক এক শিষ্য ইমাম বুখারীর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন ঃ "আমাদের পড়াতে গিয়ে ইমাম যুহলী যখন-তখনই খালকে কুরআনের সেই জটিল ও দুর্বোধ্য মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আর আপনার সম্পর্কেও নানারূপ প্রীতিকর মন্তব্য করেন। আমরা তাঁর সাথে কথায় পেরে উঠি না। তাই আপনিই পরামর্শ দিন— আমরা এমতাবস্থায় কি করতে পারি।"

ইমাম বুখারী বললেন, "উফাববিযু আমরি ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ।" "আমার সব কিছুই আমি আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করছি। নিশ্চয়ই তিনি মানবকুলে সর্ব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতএব হে সর্বান্তর্যামী আল্লাহ! তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, আমি এখানে শাসনকার্য পরিচালনা করতে অথবা শিক্ষকের সুউচ্চ আসন লাভ করতে আসিনি। দেশে না গিয়ে এখানে এসেছিলাম এই জন্য যে, দেশের কতগুলো মন্দ লোক আমার বিরোধিতা করছিল। কিন্তু এখন দেখছি এখানে এসেও আদৌ ভাল করিনি। আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী আর অপূর্ব জনপ্রিয়তা দেখে ইমাম যুহলী আজ হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত। এখানে তাই আর অবস্থান করা কোনক্রমেই সীমচীন হবে না। অতএব হে আহমদ বিন সালামাহ! আগামীকাল প্রত্যূষেই আমি এখান থেকে প্রস্থান করবো।[১]

বলা বাহুল্য, পরদিনই তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে তাঁর নিজ দেশ বুখারার অভিমুখে রওয়ানা হন। কাযী ইব্‌ন খাল্লিকান (মৃত্যু ঃ ৬৮১ হিঃ) স্বীয় সনদের মাধ্যমে বলেন ঃ "এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে ইমাম বুখারী হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাফিজ যুহলীর নাম আর প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করতেন না। বরং মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া যুহলীর পরিবর্তে শুধুমাত্র মুহাম্মদ কিংবা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বলেই ক্ষান্ত হতেন।[২]

ইমাম বুখারীর প্রতি হাফিজ যুহরীর এই অপ্রীতিকর রূঢ় ব্যবহারে ইমাম মুসলিম মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই নিরুপায় অবস্থায় কাপড়ে মাথা ঢেকে তিনি ক্ষুণ্ন মনে সোজা বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ইতিপূর্বে তিনি ইমাম যুহরীর কাছ

১. মাসিক তরজুমানুল হাদীস, দ্বাদশ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, মওঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানীর প্রবন্ধ; ৪৮২ পষ্ঠা।

২. সাইয়েদ যহুরুল হক কৃত তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসিন, ২৪ পৃষ্ঠা, কওমী কুতুবখানা, দিল্লী।

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তার যে সমস্ত কপি প্রস্তুত করেছিলেন— সে সবগুলো উটের পিঠে বোঝাই করে ফেরত পাঠিয়েছিলেন! ইমাম যুহলী এতে করে আরও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং উস্তাদ-শাগরিদের মুলাকাত ও কথাবার্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

অতঃপর ইমাম মুসলিম স্বীয় জন্মভূমি নিশাপুরের গণ্ডি পেরিয়ে হাদীস শাস্ত্রের সন্ধানে দূরদূরান্তে যাত্রা শুরু করেন। ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তমদ্দুনের তৎকালীন মর্মকেন্দ্র একমাত্র বাগদাদ নগরীতেই তিনি ইলমে-হাদীসের খোঁজে কয়েকবার গমন করেন। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থানের পর হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। বাগদাদ নগরী অভিমুখে তাঁর শেষ সফর সূচিত হয় ২৫৯ হিজরীতে। এছাড়া তিনি হিজায, ইরাক, মিসর, ইয়ামেন, সিরিয়া প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমিতে প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্র-বিশারদ মনীষীদের খিদমতে দীর্ঘদিন অবস্থান করে গভীর জ্ঞানানুশীলন করেন, এতে করে তাঁকে কম কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তবুও কোনদিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার দুরূহ সাধনায় তিনি যেরূপ অবিশ্বাস্যরূপে সাফল্য লাভ করেছিলেন তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। প্রতিটি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ মনীষীবৃন্দের খিদমতে অবস্থান করে হাদীসশাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক ফনুনাতে বিপুল পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তিনি উচ্চ সম্মান লাভ করেন। কথিত আছে যে, চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া প্রমুখ তৎকালীন খ্যাতনামা আলিমের পদপ্রান্তে হাযির হয়ে তাঁর অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন। যে অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় ও অতুলনীয় তিতিক্ষাকে সম্বল করে রাসূলে আকরাম (সা)-এর রেখে যাওয়া জ্ঞানামৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার তিনি জীবন ভরে আকণ্ঠ পান করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ যেমন অত্যন্ত বিস্ময়কর, ঠিক তেমনি চিত্তাকর্ষক।

ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ও শিক্ষকদের যথাযথ সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে যে সমস্ত খ্যাতনামা মনীষীর শিস্যত্ব গ্রহণ করে তিনি নিজেকে ধন্য ও গৌরাবান্বিত মনে করতেন, তন্মধ্যে হাফিজ মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া যুহলী, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া নিশাপুরী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী, সাঈদ ইব্ন মানসুর, শারবান ইব্ন ফাররোখ, আহমদ ইব্ন ইউনুস, ইসমাঈল বিন ওয়াইস, দাউদ বিন আমরুযবী, কুতায়বা বিন সাঈদ, হায়শাম বিন হারিসা, মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুহাম্মদ বিন মিহরান, জামালুদ্দীন, আবূ আইনান মিসামায়ী, আমর ইব্ন সাওয়াদ, হারমালা বিন ইয়াহিয়া, আবূ মুসাআব প্রমুখ থেকেও তিনি রেওয়ায়েত করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরিউক্ত খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে হাদীস জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইমাম বুখারীর কাছেই ইমাম মুসলিম সুদীর্ঘ দিন ধরে অনন্য চিত্তে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাত্মা ইমাম বুখারীর বদৌলতেই তিনি হাদীসশাস্ত্রে এতদূর ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করে মুসলিম জগতে অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। ইমাম বুখারীকে তিনি এতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন যে, সব সময় ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুসরণ করতেন, আর কিভাবে যে এই শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদের খিদমতে স্বীয় অনাবিল ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করবেন— সে চিন্তায় তিনি সব সময় বিভোর হয়ে থাকতেন। গুরুর পবিত্র মুখ নিঃসৃত হাদীসের অমিয় বাণীর পীযুষধারা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে প্রায়ই তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। আবার কখনো কখনো অব্যক্ত আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই কেঁদে ফেলতেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্থিত কোণে স্বীয় শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইমাম বুখারীর জন্য এতদূর ভক্তি অনুরাগ ও আদব-সম্মান বিদ্যমান ছিল যে, তাঁর বিপক্ষে কোনও কথা বা কোনও অভিযোগ-অনুযোগই বরদাশত করতে পারতেন না তিনি। এই শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এবং তাঁর প্রতি অনাবিল ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণের অপরাধে ইমাম মুসলিমের সঙ্গে হাফিজ যুহলী (মৃত্যু ঃ ২৫৮ হিঃ) অতি কর্কশ ও রূঢ় ভাষায় কথা বলতে এবং তাঁর সঙ্গে নানারূপ অপ্রীতিজনক ও বৈপিত্রীসুলভ আচরণ করতে শুরু করেন। এমন কি একদিন স্বীয় দর্সগাহ বা শিক্ষাগারে অগণিত ছাত্র-জনতার সমাবেশে ইমাম মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "বুখারীর মতবাদের প্রতি অন্ধ ও নীরব সমর্থন যুগিয়ে যারা শাব্দিক কুরআন মজীদকে অসনাতন ও সৃষ্ট বলে অভিমত প্রকাশ করে, আমার দর্সগাহে আজ থেকে তাদের কোনই প্রবেশাধিকার নেই।"

স্বীয় উস্তাদের কাছ থেকে এই অনভিপ্রেত আচরণ পেয়ে ইমাম মুসলিম গভীর দুঃখ ও ব্যথায় জর্জরিত হয়ে পড়লেন। তাই আর কালবিলম্ব না করে তিনি বস্ত্রাবৃত মস্তকে সে স্থান ত্যাগ করলেন। উস্তাদ যুহলীর পক্ষ থেকে এই অযাচিত অবজ্ঞা ও অবমাননা শেষ পর্যন্ত ছাত্রের আবেগভরা মনে ভাবান্তর ঘটিয়ে তাঁকে দেশান্তর হতে বাধ্য করে।

সত্য কথা বলতে কি, ইমাম মুসলিম তাঁর মুহতারাম উস্তাদ ইমাম বুখারীর এতদূর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন এবং তাঁর প্রতি এত বেশি আদব সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন যে, প্রায়ই তিনি ইমাম বুখারীর কপোল দেশে চুম্বন দিতেন, আর অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলতেন ঃ

"দা'নী উক্বাবিলু রিজলাইকা ইয়া আমীরাল-মু'মিনীনা ফীল হাদীস।"

http://islaminonesite.wordpress.com

"ওগো হাদীস জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র সম্রাট! দয়া করে আপনার পদযুগল চুম্বনের অনুমতি দিন।" এভাবেই তিনি জগতের বুকে অপূর্ব গুরুভক্তির এক সুমহান আদর্শ কায়েম করে গেছেন। তাঁর এই অন্যতম উস্তাদ ইমাম বুখারীকে তিনি সাধারণত সাইয়িদুল মুহাদ্দিসীন বলে সম্বোধন করতেন। হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী (মৃত্যু ঃ ৮৫২ হিঃ) তাঁর 'ফাতহুল বারী' নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেন, "ইমাম বুখারী যেদিন নিশাপুরের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, সেদিনই ইমাম মুসলিম একটা 'মুআল্লাক'[১] হাদীস তাঁর সামনে পেশ করে বলেন, "আপনার কাছে এই হাদীসের যদি কোনও সনদ থাকে তবে দয়াপূর্বক তা ব্যক্ত করে হাদীসটিকে 'মুত্তাসিল' হিসেবে পেশ করুন। আর এই সনদে কোনও দোষত্রুটি নিহিত থাকলে তাও প্রকাশ করুন।

ইমাম বুখারী এই প্রশ্ন শোনা মাত্রই জবাব দিলেন যে, উক্ত হাদীসের সনদ মুত্তাসিল[২] বা সংলগ্ন সূত্র। অতঃপর তিনি উক্ত হাদীসের রাবীসহ তা শুদ্ধভাবে পাঠ করলেন। ইমাম মুসলিম তা শ্রবণ করে ইমাম বুখারীকে আবার সসম্মানে জিজ্ঞেস করলেন, "এর চাইতে হাদীসটির আরও কোনও উৎকৃষ্টতর সনদ আছে কি ?" ইমাম বুখারী ধীর গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ঃ "হ্যাঁ উত্তম সনদ আছে বটে ঃ কিন্তু তা দোষত্রুটি বিমুক্ত নয়।" একথা শুনে ইমাম মুসলিম একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তাই বজ্র নির্ঘোষে অবাক বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"

অতঃপর তিনি বিনয়-নম্র বচনে ইমাম সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জানালেন ঃ "দয়া করে আমার কাছে এর ইল্লত বা প্রচ্ছন্ন কারণটা ব্যক্ত করুন।" তিনি তদুত্তরে বললেন ঃ

'উসতুর মা সাতারাল্লাহ্' অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য যা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, তুমিও তা প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করো।" কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম মুসলিম তাঁর প্রচ্ছন্ন দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য একান্তভাবে ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন এবং ইমাম বুখারীর ললাটদেশ চুম্বন করে পুনরায় তিনি উৎসুক নেত্রে তার প্রচ্ছন্ন দোষত্রুটির কথা জানতে চাইলেন। তাঁর এই উপর্যুপরি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার আতিশয্য দেখে ইমাম সাহেব বললেন ঃ "উকতুব ইনকুনতা লাবুদ্দা'। যদি না লিখে তুমি ক্ষান্ত হতে না চাও তবে লিখে নাও।" তারপর ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসের নির্দোষ সনদ সঠিকভাবে বর্ণনা করলেন। ইমাম মুসলিম তা শ্রবণ করে সোৎসাহে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ

---

১. কোন হাদীসের সনদ-সূত্রে সাহাবীর পর এক বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে 'মু'আল্লাক হাদীস' বলে।

২. যদি কোনও হাদীসের সনদ-সিলসিলায় কোনও রাবীই (Narrator) বাদ না পড়ে বরং প্রতি স্তরেই সকল রাবীর নাম যথাযথভাবে উল্লিখিত থাকে, তবে তাকেও, 'মুযাসিল' হাদীস বলা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

"লা ইউবগিযুকা ইল্লা হাসিদুন, ওয়া আশ্‌হাদু আন্ লাইসা ফীদ্দুনিয়া মিসল্‌কা।"

"আল্লাহ্‌র শপথ, আপনার সাথে কেউ কোনদিন বিদ্বেষভাব পোষণ করতে পারে না; আর আমি মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সারা দুনিয়ায় এ ব্যাপারে আপনার জুড়ি মেলা ভার।"[১]

নিশাপুরের মাটিতে ইমাম বুখারীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষে ইমাম মুসলিম স্বয়ং বলেন ঃ সেই শুভদিনে তাঁর শুভাগমনের কথা শুনে নিশাপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর যোগ্য সম্বর্ধনার জন্য দু'তিন মাইল পর্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান। ইতিপূর্বে এতো বিপুল জাঁকজমক ও শান-শওকতের সঙ্গে কোনও রাজাধিরাজ বা বিদ্বজ্জনকেও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়নি। এই ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা উপলক্ষে অগণিত পদাতিক অসংখ্য গর্দভ ও খচ্চরারোহী এবং চার হাজার অশ্বারোহী যোগদান করেছিলেন।[২]

ইমাম মুসলিমের উস্তাদগণের সংখ্যা যেমন দিগন্ত বিস্তৃত, ঠিক তেমনি তাঁর শাগরিদগণের সিলসিলাও সুদূরপ্রসারী। আবূ হাতেম রাযী (মৃত্যু ঃ ২৭৭ হিঃ), আবূ ঈসা তিরমিযী (মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিঃ), আবূ বাকর ইব্‌ন খুযায়মা (মৃত্যু ঃ ৩১১ হিঃ), আবূ আওয়ানা বিন ইসহাক (মৃত্যু ঃ ৩১১ হিঃ), ইয়াহিয়া ইব্‌ন সায়েদাহ প্রমুখ স্বনামধন্য হাদীসবেত্তা তাঁর শিষ্যবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তাঁর আরও শিক্ষকমণ্ডলী এবং হাফিজ যারা মান-সম্মান ও পদমর্যাদায় তাঁর সমকক্ষ, তাঁরাও তাঁর কাছ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবূ হাতেম রাযী, ইমাম তিরমিযী, মূসা ইব্‌ন হারুন, আহমদ ইব্‌ন সালামাহ ও আবূ বাকার ইব্‌ন খুযায়মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সবাই ইমাম মুসলিমের জন্য একান্ত গৌরবের বস্তু এবং উত্তরকালে সবাই এক একজন উচ্চ শ্রেণীর মুহাদ্দিসরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

এ দেশের খ্যাতিমান হাদীসবেত্তা শায়খ আবদুল হক দেহলভী (মৃত্যু ঃ ১০৫২ হিঃ) বলেন ঃ "মহামতি ইমাম মুসলিম ইসলামী জগতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনগুলোতে বিভিন্ন উস্তাদদের কাছ থেকে চার লক্ষ হাদীস আহরণ করেন। এ থেকেই তাঁর অনন্য সাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান পিপাসা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি ও অপরিসীম বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় মেলে। এই অনুপম জ্ঞান-গরিমা ও অনুসন্ধিৎসার বলেই তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্রই যশস্বী হয়ে উঠেন এবং আহলে সুন্নাহগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হওয়ার অতি গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন।[৩]

---

১. হাফিজ ইব্‌ন হাজর কৃত ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামা হাদিউস সারী, পৃঃ ৪৮৯।

২. আল-ফাওয়াইদুদ্ দারারী নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, ৫২ পৃঃ, সীরাতুল বুখারীর বরাতে।

৩. আশিয়াতুল লুমরাত, শায়খ আবদুল হক দেহলভী, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃঃ। মিরকাত, মোল্লা আলী কারী, ১ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

শুরু থেকেই ইমাম মুসলিমের মনে আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাবলম্বী ও অমুখাপেক্ষী হওয়ার মনোভাব এতদূর প্রবল ও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও তিনি কখনও কোনও দানশীল ব্যক্তির গলগ্রহ হতে চান নি। মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ভাষণেরও তিনি ধার ধারতেন না। আজীবন তিনি কারো গীবত, পরনিন্দা বা পরকীয় চর্চা করেননি। তিনি কোনদিন কাউকে মারধর, প্রহার, তিরস্কার বা গালিগালাজ করেন নি। সত্যিই স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সরল মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের মালিক ছিলেন তিনি। অথচ হাদীসশাস্ত্রে বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করার দিক দিয়ে সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। বস্তুত তিনি ছিলেন সবার উর্ধ্বে। কারো কারো মতে তিনি ইমাম বুখারীর চাইতেও উচ্চ স্থানের ও পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

ইমাম মুসলিম সম্বন্ধে তাঁর শায়খ ও সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেসব সুন্দর সুন্দর অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, নিচে আমি তার কিছু কিছু উক্তি বিবৃত করছি।

ইমাম সাহেবের অন্যতম উস্তাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল ওয়াহাব ফাররা বলেন ঃ "মানবমণ্ডলীর মধ্যে তিনি বিশিষ্ট আলিমদের ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন অগাধ বিদ্যাবত্তার অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁর সদগুণরাজি ছাড়া অন্য কিছুই আমি অবগত নই।"

ইব্‌ন আখরাম বলেন ঃ "আমাদের এই শহর মাত্র তিনজন প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাকে জন্ম দিয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া, ইব্রাহীম বিন আবি তালিব ও ইমাম মুসলিম।"

ইসহাক ইব্‌ন কোশাদ বলেন ঃ "যতদিন আল্লাহ আপনাকে মুসলমানদের জন্য জীবিত রাখবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা পরম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো না।"

হাফিজ আবূ কুরায়শ বলেন ঃ "দুনিয়ার বুকে হাদীস কণ্ঠস্থকারীর সংখ্যা মাত্র চারজন। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম হচ্ছেন অন্যতম।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার বুনদার বলেন ঃ "হাদীসের হাফিজ মাত্র চারজন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম দারেমী এবং আবূ যুরআহ।"

আবূ উমর বিন আহমদ বিন হামদান জুবাইরী বলেন ঃ "একদিন আমি আবুল আব্বাস বিন উক্‌দাহকে এই উভয় মনীষী (বুখারী ও মুসলিম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'উভয়েই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্বান।' আমি আবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারে তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ মাঝে মাঝে ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতের ব্যাপারে পদস্খলনও হয়ে থাকে। যেমন সিরিয়ার অধিবাসীবৃন্দ হতে রেওয়ায়েত করতে গিয়ে তিনি এক স্থানে সেই রাবীর নাম লিখেন আর অন্য জায়গায় লিখেন তার কুনিয়াত বা উপনাম এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি মনে করেন যে, এঁরা ভিন্ন ভিন্ন দু'জন রাবী। অথচ এ ধরনের পদস্খলন বা ভুল-ভ্রান্তি ইমাম মুসলিমদের কাছ থেকে হয়নি।"

খাতীব বাগদাদী বলেন ঃ ইমাম মুসলিম প্রতি পদক্ষেপেই ইমাম বুখারীর হুবহু অনুকরণ করেছেন!

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম প্রতি পদক্ষেপেই ইমাম বুখারীর হুবহু অনুকরণ করেছেন!

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম 'শাইখায়ন' নামে সুপরিচিত। হাদীসের বর্ণনায় যেখানে উভয়ে একমত (মুত্তাফাকুন আলায়হে) অথবা 'শাইখায়ন রেওয়ায়েত করেছেন' বলা হয়ে থাকে, সেখানে এই দুই মহাপুরুষই নির্দেশিত হয়ে থাকেন।

আগেই বলেছি, ইমাম মুসলিম কুশাইরীর অবিকল জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছুটা ইখ্‌তিলাফ রয়ে গেছে, তাই তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কাযী ইব্‌ন খাল্লিকান ও ইবনুল আসীর তাঁর নিজ নিজ গ্রন্থে যথাক্রমে ২০২ এবং ২০৬ সালের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আসীর স্বীয় মুকাদ্দমা জামেউল উসুল গ্রন্থে ২০৬ সালকে অধিকতর প্রামাণ্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (মৃত্যু ঃ ১৩৫৩ হিঃ) তাঁর তুহফাতুল আহওয়াযী নামক পুস্তকের মুকাদ্দামায় বলেন ঃ "তাঁর (ইমাম মুসলিমের) জন্ম তারিখ ও বয়স সম্পর্কে নির্ধারিত করে কেউ কোনকিছু বলেনি, তবে উস্তাদ তাকীউদ্দীন ইবনুস সালাহ্ হাকেম আবু আবদুল্লাহর কিতাব 'উলামাউল-আমসার' থেকে নকল করে এ কথাই ধারণা করেন যে, তাঁর জন্ম ২০৬ সালে হওয়াই বেশি স্বাভাবিক। (মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী দ্রষ্টব্য)

এই তো গেল জন্ম তারিখ সম্পর্কিত ভিন্নমতের কথা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কারো কোনও দ্বিমত নেই। নিশাপুরের অন্তর্গত নসরাবাদ শহরে ২৬১ হিজরীর ২৫ শে রজব সন্ধ্যার সময় মাত্র ৫৫ বছর বয়সে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে হাফিজ আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন আলী আল-খাতীব (মৃত্যু ঃ ৪৬৩ হিঃ–১০৮১ খৃঃ) তাঁর 'তারিখুল-বাগদাদ' নামক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদানে একটা অভিনব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

মহামতি ইমাম মুসলিম জ্ঞানানুশীলনে, সন্দেহ ভঞ্জনে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান কাজে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। এ সব কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল আর তিনি এতে খুব আনন্দও অনুভব করতেন। তাঁর এই নিরলস শাস্ত্রানুশীলন ও জ্ঞানচর্চার জন্য রীতিমতো বড় বড় মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ইমাম সাহবের খিদমতে হাযির হয়ে তাদের শংকা ভঞ্জন

http://islaminonesite.wordpress.com

মানসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করতেন, আর তিনি খুশি মনে অম্লান বদনে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে সেই প্রশ্নকারীর সংশয় দূর করতেন। হাদীসশাস্ত্র আলোচনার জন্য একবার এই ধরনের এক মহতি সভা আহূত হয়। এতে বড় বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বানমণ্ডলী ও হাদীসবেত্তা যোগদান করেন। সক্রিয় অংশ নিয়ে ইমাম মুসলিম ছিলেন এ সভার পুরোভাগে। তাই ইমাম সাহেবের উপর যথাসময়ে চারদিক থেকে প্রশ্নের শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তিনি স্মিত হাস্যে নির্ভীক চিত্তে এক এক করে সকল প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়ে উপস্থিত জনগণকে আপ্যায়িত করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা অতি দুর্লভ হাদীস সম্পর্কে ইমাম সাহেবের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দুঃখের বিষয়, সেই হাদীস সম্পর্কে ইমাম সাহেব অবহিত ছিলেন না। তাই নিরুত্তর হয়ে সভাস্থল ত্যাগ করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। অতঃপর তিনি হাদীসটি অনুসন্ধান করার জন্য পাঠাগারের নির্জন কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে সতর্ক করে দেন যে, কেউ যেন এই কক্ষাভ্যন্তরে ঢুকে তাঁর অনুসন্ধান কাজে অন্তরায়ের সৃষ্টি না করে। এমন সময় পরিবারের একজন বলে উঠলেন ঃ "এক্ষুণি তোহফা স্বরূপ একঝুড়ি খেজুর এসেছে, তাই সর্বাগ্রে তার বিধিব্যবস্থা করুন।" ইমাম সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ "এর বিধিব্যবস্থা পরে হবে, আপাতত তা আমার কাছে রেখে দাও।" তারপর তিনি হাদীস অনুসন্ধান কাজে ব্যাপৃত হলেন। এদিকে তিনি তন্ন তন্ন করে হাদীসের গ্রন্থমালা মন্থন করে চলছেন, আর এই কর্মব্যস্ততায় ও তন্ময়তার ফাঁকে সামনে রক্ষিত খেজুরের ঝুড়ি থেকে অন্যমনস্কভাবে একটির পর একটি করে খেজুর মুখে পুরছেন। এভাবে তিনি এতদূর তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে, সীমার অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার কথা আদৌ ভাবতে পারেননি। তাঁর অভীপ্সিত হাদীসটি প্রাপ্ত হয়ে যখন তিনি স্বস্তি লাভ করলেন তখন ঝুড়ির সমস্ত খেজুর নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে অত্যধিক পরিমাণ খেজুর খাওয়ার ফলে অচিরেই তাঁর পরিপাকযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল এবং তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ পীড়ার আর উপশম হলো না। কয়েকদিন ধরে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তারপর একদিন বিশ্ব নিয়ন্তার দরবার থেকে ইলমে-নববীর এই ধারক ও বাহক ইমাম মুসলিম কুশাইরীর নামে আমন্ত্রণ এলো। সেই আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে ২৬১ হিজরীর ২৫শে রজব রোববারের গোধূলি সন্ধ্যায় নিখিল নশ্বর জাহানের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি অবিনশ্বর লোকে মহাপ্রস্থান করেন। পরদিন তাঁর লাশ নাসরাবাদ নামক পল্লী কাননের সমাধিগর্ভে চিরশয্যায় শায়িত করা হয়। ইন্না লিল্লাহে ...... রাজেউন।[১]

---

১. তারীখে বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড ; ১০৩ পৃ। তাহযীবুত তাহযীব, দশম খণ্ড; ১২৭ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

মহামতি ইমাম মুসলিম (র)-এর বিষাদময় মহাপ্রয়াণের পর প্রখ্যাত হাদীসবিদ আবূ হাতেম রাযী একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পান। এই স্বপ্নের মধ্যে তাঁর অবস্থা ও কুশল সংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার উত্তরে বলেন ঃ "আল্লাহ্ পাক আমার জন্য দয়াপরবশ হয়ে বেহেশতের সুবিস্তৃত নন্দনকাননকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আমি স্বাধীনভাবে এখন যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারি।"

অনুরূপভাবে আবূ আলী যাওয়ানী নামক আর একজন খ্যাতিমান হাদীসবেত্তাকে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নের মধ্যে জিজ্ঞেস করেন ঃ "কী করে আপনার এই মুক্তি লাভ সম্ভব হলো ?" তদুত্তরে তিনি স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে সহীহ্ মুসলিম শরীফের কতকাংশ দেখিয়ে বলেন ঃ "এই হাদীসখণ্ডের দৌলতেই নরকাগ্নি থেকে আমার মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে।"[১]

উপর্যুপরি যশঃগৌরব ও খ্যাতির সুউচ্চ আসন লাভ করেও মহামতি ইমাম মুসলিম নিশ্চিত মনে নির্বিকার চিত্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। অধ্যাপনার মহান ও পবিত্র আসন অলংকৃত করে তিনি অগণিত মুসলিম সন্তান-সন্ততির হৃদয়চিত্তকে জ্ঞানালোক দ্বারা আলোকিত ও পরিপূর্ণ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র মৌখিক শিক্ষা দানে তাঁর দীন সেবার অতৃপ্ত পিপাসা নিবৃত্ত হয়নি। তাই তিনি নিরলস লেখনী চর্চা ও অবাধ ধর্ম-সাহিত্য সাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী ও আগ্রহান্বিত। তাঁর আজীবন লেখনী চর্চা ও সাধনার মূল উপাদান এবং জীবনাচরণের প্রধান ভিত্তিই ছিল ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের মূল কুরআন এবং হাদীসশাস্ত্র। এ শাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালবাসা তাঁর ঐতিহ্যাভিমানী সুপ্ত মানুষেরই ফল। সুদীর্ঘ দিন ধরে তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার অমৃত ফল হিসাবে তাঁর রত্ন-গ্রন্থ ও সদা চলমান লেখনী পশ্চাতে রেখে গেছে মূল্যবান গ্রন্থরাজির সমাবেশ। তন্মধ্য থেকে নিম্নে আমরা মাত্র কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থমালার নামোল্লেখ করছি, যেগুলোর অধিকাংশই অধুনা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়েছে ঃ

(১) 'কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা' —ইমাম বুখারীও এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বই লিখেছেন; কিন্তু ইমাম মুসলিমের বইটি তার চাইতে অনেকাংশে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (২) 'কিতাবু হাদীসে আমর ইব্ন শুয়াইব' —এটি হযরত আমর ইব্ন শুয়াইবের হাদীসসমূহ সম্পর্কে গবেষণামূলক তত্ত্বানুসন্ধান। (৩) কিতাবুল ইনতিফা বে ইহাবিস সিরা, (৪) কিতাবুত তাময়ীয, (৫) কিতাবুল ইলাল, (৬) কিতাবুল ওয়াহদান, (৭) কিতাবুল আফরাদ, (৮) কিতাবুল আকরাম, (৯) কিতাবুল সওয়ালাত-ই-আহমদ বিন হাম্বল (১০) কিতাব মাশাইখি মালিব, (১১) কিতাবু মাশাইখি সওরী, (১২) কিতাবু

---

১. মাওলানা আবদুস সামী অনূদিত বুসতানুল মুহাদ্দিসিন, ১৭৯ পৃষ্ঠা

http://islaminonesite.wordpress.com

মাশাইখি শুবা, (১৩) কিতাবু মান লাইসা লাহু ইল্লা বাবিন ওয়াহিদিন, (১৪) কিতাবুল মুখাযরামিন, (১৫) কিতাবু আওলাদিস সাহাবা, (১৬) কিতাবু আওহামিল মুহাদ্দিসীন, (১৭) কিতাবুত তাবাকাত আত-তাবিয়ীন (১৮) কিতাবু ইফরাদুস সামিয়ীন, (১৯) মুসনাদে কাবীর, (২০) আল জামি আলাল আবওয়াব, (২১) সহীহ মুসলিম ইত্যাদি।

মহামতি ইমাম মুসলিম কুশাইরী রচিত গ্রন্থমালার এই সংক্ষিপ্ত সূচি 'তুহফাতুল হুফ্ফায' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলো। সকল পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ দানের উপযুক্ত স্থান এটা নয়। তবে উপরিউক্ত গ্রন্থ তালিকার মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থ 'সহীহ্ মুসলিম' সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বললে বিবরণ একেবারেই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ইমাম সাহেবের সংকলিত অন্য সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সহীহ্ মুসলিম শরীফ সমগ্র ইসলাম জগতে হাদীসশাস্ত্রে সমধিক প্রচার, প্রসার ও সমাদর লাভ করেছে। বস্তুত এটি ইমাম সাহেবের জীবনব্যাপী সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতময় ফল। ইলমে হাদীসের মহাসমুদ্র মন্থন করে 'সহীহ্ মুসলিম' নামক তাঁর এই অনবদ্য অবদানটি তিনি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন! বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে তাঁর সংগৃহীত চার লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে তিন লক্ষ হাদীস বাছাই করে সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি উসুলে হাদীসের সূক্ষ্ম মানদণ্ডে ও কষ্টিপাথরে পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করতে থাকেন।[১] পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য হতে সাত হাজার হাদীস (তাক্রার বা পুনরাবৃত্তি ছাড়া চার হাজার) তিনি নির্বাচন করেন। তারপর পুনরুল্লেখ সহ এই সাত হাজার হাদীসকে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত ও সুবিন্যস্ত করে 'সহীহ্ মুসলিম' নামক শ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে হাদীসে উসূল শাস্ত্রকারগণের উক্তি এই ঃ

"আসাহ্হুর রিওয়াইয়াতি মাত্তাফাকা আলাইহিশ শাইখান সুম্মান ফারাদা বিহল বুখারী সুম্মানফারাদা বিহী মুসলিমুন।"

অর্থাৎ–"সব চাইতে বিশ্বস্ততম ও নির্ভরযোগ্য হচ্ছে সেই হাদীস, যার রেওয়ায়েত সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম একমত হয়েছেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধও করেছেন। তারপর ঐ সমস্ত হাদীস, যেগুলো ইমাম বুখারী স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়েত করেছেন; তারপর যা ইমাম মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।"

ইমাম কুরতুবীর নিকট সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের স্থান ও পদমর্যাদা একই রকমের। কিন্তু আবু আলী নিশাপুরী প্রমুখ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের স্থলে সহীহ্ মুসলিমকেই 'সিয়াহ সিত্তাহ'র প্রথম স্থান দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"মা তাহতা আদীমিস্ সামাই আসাহ্হুল কুতুবি বাদাল কুরআনি মিন কিতাবী মুসলিমিন ফী ইলমিল হাদীস।"

---

১. আবূ যুরআহ রাযীর কাছ থেকেও এই হাদীস সংকলনের ব্যাপারে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ–"পবিত্র কুরআনের পর গগনতলে ইমাম মুসলিম প্রণীত এই 'জামেউস সহীহ্' ছাড়া বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের আর একটিও নেই।"

বস্তুত পাশ্চাত্যে মনীষীরা সহীহ্ বুখারীর উপর সহীহ্ মুসলিমের স্থান নির্দেশের চেষ্টা করতে গিয়ে একে ইলমে হাদীসের শেষ্ঠতম অনবদ্য গ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ থেকে মুসলিম শরীফের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অতি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

তবে প্রাচ্যদেশের পণ্ডিত ও সুধীসজ্জনরা পবিত্র ঐশীবাণী আল কুরআনের পর বিশুদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হিসাবে সহীহ্ বুখারীর স্থানই নির্দেশ করেছেন। এতে কোনও দ্বিমত নেই। ভারত-গুরু শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (মৃত্যু ঃ ১১৪৫ হিঃ) স্বীয় ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' এই উভয় গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আম্মাস সাহীহায়নে ফাকাদ ইত্তাফাকাল মুহাদ্দিসুনা আলা আন্না জামিয়া মা ফীহিমা মিনাল মুত্তাসিলিওয়াল মারফুই সাহীহুন বিল কাত্ই ওয়া ইন্নামা মুতাওয়াতিরানে ইলা মুসান্নি ফীহিমা ওয়া ইন্নাহু কুল্লুমান ইউহাবভিনু আমরাহুমা ফাহুয়া মুবতা দিউন মুত্তাবিউন গাইরা সাবী লিল মু'মিনিনা।"

"বুখারী ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, এই দুই গ্রন্থে যে সমস্ত মুত্তাসিল ও মারফু হাদীস[১] স্থান পেয়েছে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বিশ্বস্ত এবং উক্ত দুই গ্রন্থের সংকলন পর্যন্ত সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি এই অমর গ্রন্থদ্বয়ের সম্মানহানির কারণ হবে, সে ব্যক্তি হবে বিদ্আতী এবং মু'মিনগণের অবিসম্বাদিত পথ থেকে বিচ্যুত বিভ্রান্ত।[২]

একটু ধীরস্থির চিত্তে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা করলে অতি সহজেই এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারী শরীফের স্থান যেমন সবার আগে, ঠিক তেমনি শব্দ বিন্যাস ও তারতীবের দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিমের স্থান প্রথমে। মুসলিম শরীফে হাদীসের বিন্যাস সত্যিই অভূতপূর্ব। ইমাম মুসলিম প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত হাদীসের খুঁটিনাটির বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রথমে হাদীসের পারস্পরিক স্থান নির্ধারণ করেছেন। তারপর তিনি প্রতিটি হাদীসকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফ —এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে কোনটিকে কোনটির উপর প্রাধান্য দিতে ও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, তার

১. মুত্তাসিল হাদীসের সংজ্ঞা ইতিপূর্বেই পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে; আর মারফূ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ বা বর্ণনা সূত্র (হাদীসের বর্ণনাকারী পরম্পরা) স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) পর্যন্ত পৌছেছে।

২. শাহ ওয়ালী উল্লাহকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', পৃষ্ঠা ১০৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

সুষ্ঠু মীমাংসা ও সমাধানকল্পে হাফিজ আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী আর রাবী ইয়ামেনী শাফেয়ী নিম্নের এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

তানাযাআ' কাওমুন ফীল বুখারী ওয়া মুসলিমিন।
লাদাইয়া ওয়া কালু আইউ যাইনে মুকাদ্দামু ॥
ফাকুলতু লাকাদ ফাকাল বুখারী ফী সিহাতিন।
কামা ফাকা হুসনিস সানাআতি মুসলিমু ॥

"জনগণের এক বিশিষ্ট দল আমার সামনে এসে বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করলো আর বললো ঃ উভয়ের মধ্যে কোনটির পর কোনটিকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে ? তদুত্তরে আমি বললাম ঃ বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারী শরীফ যেমন অগ্রগণ্য, ঠিক তেমনি অভিনব পরিবেশন ও বিন্যাসের দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিমও অতুলনীয়।"[১]

মুসলিম শরীফের সনদ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা এবং রাবীদের যাঁরা আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা হচ্ছেন আহমদ বিন আলী ইস্পাহানী (মৃত্যু ঃ ২৬৯ হিঃ) এবং ইবনু মাঞ্জু ওয়াইয়াহ (মৃত্যু ঃ ৪২৮ হিঃ)।

পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতরা সহীহ্ মুসলিমকে বুখারী শরীফের উপর যে প্রাধান্য ও মর্যাদা দান করেছেন, তার কারণ তাঁরা এভাবে বর্ণনা করেন যে, সহীহ্ মুসলিমে এমন কতকগুলো মূল্যবান কথা রয়েছে যা বুখারী শরীফে নেই। যেমন ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস গ্রন্থে শর্ত করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র ঐ সমস্ত হাদীসগুলোই মুসলিম শরীফে শামিল করবেন, যেগুলো দুইজন নির্ভরশীল তাবেঈ দুইজন সাহাবী[২] থেকে রেওয়ায়েত করেন। অনুরূপভাবে প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই তিনি দুইজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত রাবী থেকে রেওয়ায়েত করেন। ইমাম বুখারী কিন্তু তাঁর হাদীস গ্রন্থে এ ধরনের কোনও শর্ত আরোপ করেন নি।

"ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতে" নামক হাদীসের রেওয়ায়েতটিও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে বটে; কিন্তু তা ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী নয়; বরং বরকত এবং কল্যাণ মনে করেই তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিংবা হয়তো একে ব্যতিক্রম (Exception) হিসেবেও ধরা যেতে পারে।

---

১. বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, পৃঃ ১৮০; তায্‌কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃঃ ৩৪; তাজকিরাতুল হুফ্‌ফায, আল্লামা ইমাম যাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬৭।

২. সাহাবী–যারা ঈমানের সঙ্গে রাসূলে আকরাম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন আর তাবেঈ–যারা এক বা একাধিক সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন ও সাহচর্য লাভ করেছেন অর্থাৎ তাবেঈ হচ্ছেন সাহাবীদের পরবর্তী স্তরের মুসলিম।

http://islaminonesite.wordpress.com

সহীহ্ মুসলিমের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইমাম মুসলিম কুশাইরী প্রতিটি হাদীসের জন্যই তার যোগ্য মান-মর্যাদা নির্ণয় করেছেন। আর এ করতে গিয়ে তিনি প্রতিটি হাদীসের বিভিন্ন রকম সিলসিলা রেওয়ায়েত (বর্ণনাসূত্রের ক্রম) এবং বিভিন্ন ধরনের শব্দ-সম্ভারকে একত্রে জমা করেছেন। এ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই বিভিন্ন ধরনের সিলসিলা এবং শব্দ-সম্ভার দেখে পাঠকবর্গ যেন উপকার হাসিল করতে পারেন। এ বিশেষত্বটি সহীহ্ বুখারী শরীফের মাঝেও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইমাম হাফিজ আবদুর রহমান বিন আলী সানী এই সহীহ্ মুসলিমের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে যে সুন্দর আরবি কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন তার বাংলা তরজমা এই ঃ

"হে সুধী পাঠকবৃন্দ! সহীহ মুসলিম শরীফের ইল্‌ম বা জ্ঞান যেন এক সুগভীর অতল সাগর সমতুল্য। এর মধ্যে পানি প্রবাহিত হওয়ার কোনও রাস্তা বা পথ নেই। অর্থাৎ এর সমস্ত পানিই যেন একই স্থানে মওজুদ রয়েছে।"

ইমাম মুসলিম স্বীয় হাদীসগ্রন্থে শব্দমালার এত বেশি সম্ভাব্য খেয়াল রেখেছেন যে, 'রিওয়ায়িত বিল মা'নি', অর্থাৎ এক শব্দের ভাবকে অন্য শব্দের দ্বারা তিনি প্রকাশ করেন না। এ ব্যাপারে তিনি এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, 'রাবী যদি অপর রাবী থেকে একটি শব্দ সম্পর্কেও ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে সেই উভয় শব্দের একই অর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক রাবী শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। একজন রাবী যদি কোনও হাদীসকে 'হাদ্দাসানা' আর অপর জন 'আখবারানা' বলে বর্ণনা করেন, তবে সেটাও শব্দগত পার্থক্য দেখিয়ে আলাদাভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। কারণ তাঁর মতে এই উপরিউক্ত দুই শব্দের মধ্যেও তফাত রয়েছে।

এছাড়া ইমাম মুসলিম স্বীয় হাদীসগ্রন্থে 'তালীকাত'কে যথাসম্ভব বর্জন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর মতো তিনি হাদীসের সঙ্গে সাহাবী ও তাবেঈনদের উক্তিসমূহকে উল্লেখ করেন নি। কারণ ইমাম মুসলিম চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের সাথে অন্য কোনও মানুষের উক্তির সংমিশ্রণ যেন কোনক্রমেই না ঘটে। মোটকথা সহীহ্ মুসলিমে 'তালীকাত' বা সনদবিহীন হাদীস ততটা নেই। আর থাকলেও তার সংখ্যা অতি নগণ্য। পক্ষান্তরে সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে তালীকাতের অপূর্ব সমাবেশ। ইল্লা মাশা আল্লাহ!

আল্লামা ইমাম আবূ যাকারিয়াহ ইয়াহিয়া বিন শারফুদ্দীন নববী (মৃত্যু ঃ ৬৭৬ হিঃ) বলেন ঃ "ইমাম মুসলিম তাঁর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সতর্কতার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন, যা তাঁর অপূর্ব ধর্মনিষ্ঠা ও অগাধ জ্ঞানের গভীরতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।" আল্লামা তাকীউদ্দিন ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ঃ ৬৪৩ হিঃ) বলেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

"সহীহ্ মুসলিম ও বুখারীতে যে সমস্ত হাদীস স্থান পেয়েছে তার সবগুলোই নিঃসন্দেহে সহীহ্, প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ। ইমামুল হারামাইন আল্লামা জুয়াইনী বলেন ঃ "যদি কোনও ব্যক্তি কসম খায় যে, সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিশুদ্ধতম সহীহ হাদীস না থাকলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তাহলে সেই স্ত্রীর উপর উক্ত তালাক কিছুতেই বর্তিবে না। কারণ এই উভয় হাদীসগ্রন্থের সবগুলো হাদীসই অকাট্যভাবে প্রমাণিত, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এর উপর দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম উম্মত একমত হয়েছেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে পুনরুল্লিখিত হাদীসগুলোকে দিয়ে মোট ৭২৭৫টি হাদীসের সমাবেশ রয়েছে। আগেই আমি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছি। আর এই পুনরুল্লিখিত হাদীসগুলোকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে এতে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০০০। এ সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম মুসলিম কুশাইরী বলেন ঃ "তিন লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে আমি এই সহীহ্ মুসলিমকে সংকলন করেছি। সমস্ত লোক যদি সুদীর্ঘ দুশো বছর ধরেও হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তবুও আমার এই হাদীসটির প্রতি লোকের পূর্ণ আশ্বাস ও ভরসা এতটুকুও শিথিল হবে না।"

ইমাম মুসলিমের সবচাইতে উত্তম সম্পদ সেইটি, যার মধ্যে ইমাম বুখারীর সুলাসিয়াতের মতো ইমাম মুসলিম থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত শুধু চারটি ওয়াস্তাহ বা মাধ্যম রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় রুবাইয়াত। এই রুবাইয়াতের সংখ্যা মুসলিম শরীফে ৮০ থেকেও বেশি। তবে সহীহ্ বুখারীর মতো এতে কোনও সুলাসিয়াত নেই। সহীহ্ মুসলিমে তালীকাতের (পরিচ্ছেদের শিরোনামার অব্যবহিত পর সনদ-বিহীন হাদীসের) সংখ্যা মাত্র দু'টি। আপাতদৃষ্টিতে এই তালীকাতের সংখ্যা চৌদ্দ বলে প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু তন্মধ্যে বারোটি হাদীস আবার সহীহ্ মুসলিমেরই অন্যত্র মুত্তাসিল বা সনদযুক্ত রূপে দেখা যায়।[১]

আল্লামা আবূ যাকারিয়াহ শরফুদ্দীন নব্বী বলেন ঃ "হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান বহুমুখী। কিন্তু সবচাইতে তাঁর শ্রেষ্ঠতম অনবদ্য অবদান হচ্ছে সহীহ্ মুসলিম। কারণ এটি তাঁর কাছ থেকে পৌনপুনিকভাবেই নকল হয়ে চলে আসছে।"

মোটকথা ইমাম মুসলিম বিরচিত এই হাদীসগ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে কিরূপ জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করেছে, তা এর ভাষ্যগ্রন্থের সংখ্যাধিক্য থেকেই কতকটা আঁচ করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক সহীহ্ মুসলিমের প্রায় ৩১খানা ভাষ্য বা বিস্তৃত শরাহ্ লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই আরবি ভাষায় প্রণীত। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুয যুনুন' নামক অমর গ্রন্থে মোট ১৫ খানা শরাহ্ বা বিশদ ব্যাখ্যার

---

১. ইত্তেহাফুন নুবালা, পৃঃ ৪৩০-৪৩১; হুজ্জিয়াতে হাদীস, মাওলানা আবদুস সালাম বাস্তবী।

http://islaminonesite.wordpress.com

কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি ভাষ্যের নাম, বৈশিষ্ট্য ও প্রণেতার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না। তাই বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমি অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের অনুরোধ জানাই 'কাশফুয যুনুন', 'ইত্তেহাফুন নুবালা' 'সীরাতুল বুখারী' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে। ইমাম মুসলিম তাঁর এই অমর হাদীসগ্রন্থকে কোনও ফিকাহ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এর প্রতিটি হাদীস ও শব্দ বিন্যাসের শৃঙ্খলাকে এত সুন্দর অভিনব আকারে রূপ দিয়েছেন যে, মনে হয় এটি যেন বেশ সুন্দরভাবেই পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ে সুবিভক্ত। এর ব্যাখ্যাতাগণ তাই অতি সহজেই ফিকাহ্ অধ্যায়ে একে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের দেশীয় সংস্করণগুলোতে ইমাম আবূ যাকারিয়া শরফুদ্দীন নব্বীর কায়েম করা বাব বা পরিচ্ছেদ শিরোনামা রয়েছে।

নিম্নে আমরা সাধ্যানুসারে সহীহ্ মুসলিমের কতিপয় প্রসিদ্ধ শরাহ্ বা ভাষ্যের নামোল্লেখ করছি ঃ

১. আল্লামা ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন শরফুদ্দীন নববী (মৃত্যু ঃ ৬৭৬ হিঃ) কৃত শারহে মুসলিম। এর নাম 'আল-মিনহাজ'। এই সুপ্রসিদ্ধ উত্তম শরাহটি প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সবচাইতে বেশি সমাদর ও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

২. আবুল ফারাজ ঈশা বিন মাসউদ আর জাওয়ারী (মৃত্যু ঃ ৭৪৩ হিঃ) কৃত শরাহ। এর নাম 'ইক্‌মাল'।

৩. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খলীফা আল-উবাই আল মালিকী (মৃঃ ৮২৮ হিঃ) কৃত শরাহ। এর নাম 'ইকমালুল মু'লিম। এটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার এতে ইমাম মাযেরী কাযী আইয়ায, কুরতুবী ও নবভী প্রমুখের ভাষ্যের সারাংশ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

৪. আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-খাতীব আল-কাস্তাল্লানী (মৃঃ ২২৩ হিঃ) কৃত একটি বিস্তৃততম বিরাট শরাহ রয়েছে। এর নাম 'আল-ইবতিহাজ'। ৮ খণ্ডে সহীহ মুসলিমের মাত্র অর্ধেকটা সমাপ্ত হয়েছে।

৫. শায়খ মুহাম্মদ নুরুল হক (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ) বিন শায়খ আবদুল হক দেহলভী কৃত 'মামবাউল ইল্‌ম নামক ফারসী শরাহ। ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক তাঁর 'Indian contribution to Hadith Literature' নামক গ্রন্থে উক্ত শরাহকে হাফিজ ফাখরুদ্দীন দেহলভীর কিতাব বলে উল্লেখ করেন। তিনি শায়খ মুহাম্মদ নুরুল হকের প্রপৌত্র।

৬. আল্লামা শায়খ মোল্লা আলী কারী আল-হারাভী (মৃঃ ১১২২ হিঃ) কৃত শরাহটি ৪ খণ্ডে পরিসমাপ্ত। ইনি পরবর্তী যুগে মক্কার অধিবাসী হন।

http://islaminonesite.wordpress.com

৭. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ – ১৮৯০ খৃঃ) কৃত শরাহটি ২ খণ্ডে সমাপ্ত। এর নাম 'আস-সিরাজুল ওহহাজ ফী শারহিস সাহীহ লি-মুসলিম বিন হাজ্জাজ'।

৮. আবূ আবদুল্লা মুহাম্মদ সানুসীর শরাহও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৯. আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১৩৯ হিঃ) কৃত মুসলিমের শরাহ।

১০. সৈয়দ মুরতজা হাসান বিলগিরামী (মৃঃ ১২০৫ হিঃ) কৃত মুসলিমের নামও 'আল-ইবতিহাজ'।

১১. ভারতবর্ষে সুরাটের অন্তর্গত ঢাবিল জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস এবং দেউবন্দ দারুল উলুমের শায়খুল হাদীস মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী দেউবন্দী (১৩০৫ – ১৩৬৯ হিঃ) কৃত মুসলিম শরীফের শরাহটি বেশ বিস্তারিত। এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। এর নাম 'ফাতহুল মুলহিম'। বিজনোরের মাদীনা প্রেস এবং জলন্ধরের ভানদা প্রেস থেকে এর বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট এর বিশটি সংস্করণ নাকি প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকেই এর অপূর্ব জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী সাহেব তাঁর এই চমৎকার শরাহটিকে হায়দারাবাদের ৭ম নিযাম খান বাহাদুর উসমানীর নামে উৎসর্গ করেন। কাবুলের বাদশাহ তিন খণ্ডে এর ফারসী তরজমা করিয়ে প্রকাশ করেছেন। এখন তাই কাবুলের ঘরে ঘরে এটি পঠিত হয়। এছড়া মাদ্রাজী এবং অন্যান্য ভাষায়ও নাকি এটি ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী এর কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বলেন ঃ "মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী তাঁর এই শরাহ্‌র মাধ্যমে মুসলিম জনসমাজের একটা বিরাট উপকার সাধান করেছেন।

কায়রোর প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ মওলানা মুহাম্মদ যাহিদনি হাসান আল-কাউসারী এই ফাতহুল মুলহিমের অতি সুন্দর সমালোচনা করেন। তাঁর এই প্রশংসামূলক সমালোচনাটি মিসরের 'ইসলাম' নামক মাসিক আরবি পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এখন এটি 'ফাতহুল মুলহিমের' শেষাংশে সংযোজিত। ফাতহুল মুলহিমের শুরুতে রয়েছে শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এক মূল্যবান ভূমিকা। এই বিস্তৃত ভূমিকাটি বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যে সুসমৃদ্ধ। ভূমিকাটি উর্দুতে ভাষান্তরিত হয়েছে। আল্লামা যাহিদুল কাউসার এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্রথম জীবনে উসমানী খিলাফতের রাজধানীতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। মুরশিদাবাদ জিলার চুয়ানপুকুর নিবাসী মওলানা আবদুস সালাম মরহুম এই মুকাদ্দামাকে কেন্দ্র করে আরবিতে একটি সুন্দর শরাহ লিখেছিলেন। উক্ত মওলানা সাহেব মহাঃ হুসেন বাসুদেব পুরীর ভগ্নিপতি।

এই তো গেল সহীহ মুসলিম শরীফের ভাষ্যের কথা। অনেকেই আবার এই সহীহ মুসলিমকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে

http://islaminonesite.wordpress.com

আহমদ বিন উমর আল-কুরতুবী, ইমাম যাকীউদ্দিন আবদুল আযীম মুনযিরী, সিরাজুদ্দীন উমর বিন আলী ইবনুল মুলকিন শাফেয়ী প্রমুখের মুখতাসার বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলো উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত মুখতাসারের নাম 'যাওয়াইদুল মুসলিম আলাল বুখারী।'[১]

আবূ বকর আহমদ বিন আলী আল-ইস্পাহানী সহীহ্ মুসলিমের রাবিগণকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর নাম 'কিতাবুন ফী আসমাই রিজালিল মুসলিম'। এছাড়া ইসতাম্বুলের প্রখ্যাত আলিমবৃন্দ সহীহ মুসলিমের সঙ্গে অতি সুন্দর টীকা-টিপ্পনীসহ বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাশিয়াহ্ সংযোজন করেন। মওলানা ওয়াহিদুজজামান হায়দারাবাদী সম্ভবত মুসলিম শরীফকে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এছাড়া এর সুন্দর ও সার্থক ইংরেজি ভাষার তরজমা করেছেন অধ্যাপক আবুদল হামিদ সিদ্দিকী। এটি আশরাফ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই ইংরেজি তরজমা সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে–

The English translation with explanatory notes of Sahih Muslim being traditions of the sayings and doings of the prophet Mohammad. The exhaustive notes and commentary based on authentic original sources of brief biographical sketches of major Hadith narrators ..... An epoch making contribution on Islamic religious literature ..... The first ever attempt at the English translation.

ইমাম মুসলিম তাঁর এই হাদীসগ্রন্থের শুরুতে একটা অতি সুন্দর মুকাদ্দমা বা ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই হয়তো তাঁর সহীহ মুসলিম এত বেশি সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ কারণেই এর মান-মর্যাদা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। এই ভূমিকার মাধ্যমে ইমাম সাহেব উক্ত হাদীসগ্রন্থ সংকলনের কৈফিয়ত, কার্যকারণ ও পটভূমি বর্ণনা করেন। এছাড়াও তিনি এতে হাদীসশাস্ত্রের রেওয়ায়েত সম্পর্কিত বহু জরুরী বিষয়বস্তু, তথ্য ও উসুল নিয়ে আলোচনা করেন। হাদীসশাস্ত্রে বহু জটিল বিষয় এবং সূক্ষ্ম উসুলী মাসআলাসমূহের আলোচনা-পর্যালোচনায় তিনি গভীর বিচার-বুদ্ধি ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। মাঝে মাঝে তিনি এই মুকাদ্দামা বা ভূমিকার মাধ্যমে স্বীয় উস্তাদ ইমাম বুখারীর প্রতি কতকটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শনও করছেন।

ইমাম মুসলিম এই মুকাদ্দামার মধ্যে হাদীসের তিনটি পর্যায় বা স্তর নির্ণয় করেন। প্রথম স্তরের হাদীস যা শুধুমাত্র পূর্ণ স্মৃতিসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য হাফিয এবং ত্রুটিবিমুক্ত

১. মুকাদ্দামা ফাতহুল মুলহিম; মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী, পৃঃ ১০০।

http://islaminonesite.wordpress.com

রাবিগণ রেওয়ায়েত করেন। দ্বিতীয় যা অপরিচিত ও অবস্থা না জানা মধ্যম পর্যায়ের রাবিগণ রেওয়ায়েত করেন। তৃতীয় যা ক্রটিপূর্ণ দুর্বল রাবিগণ রেওয়ায়েত করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর এই হাদীসগ্রন্থে শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ের হাদীসগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসকে তিনি মুতাবিয়াত বা অনুসারী হিসাবে শামিল করেছেন। আর তৃতীয় পর্যায়ের হাদীসকে তিনি সমূলে বর্জন করেছেন।

ইমাম মুসলিমের মূল হাদীসগ্রন্থের অগণিত ভাষ্যের ন্যায় এই মুকাদ্দামারও বহু ভাষ্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সত্যকথা বলতে কি, এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিলতাকে সামনে রেখেই সম্ভবত শরাহগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত মওলানা আবদুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) 'আল বাহরুল মাওয়াজ' নামে আরবি ভাষায় এর একটা সুন্দর শরাহ লিখেন। এটি বহির্জগতের আলো-বাতাস দেখতে সক্ষম হয়নি। বরং মওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পাণ্ডুলিপির আসরেই আবদ্ধ থেকে একে গুমরে গুমরে মরতে হয়েছিল। এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে তা বলা মুশকিল। অনুরূপভাবে মওলানা শামসুল হক আজীমাবাদীও (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ/১৯১১ খৃঃ) এই মুকাদ্দামার আর একটি শরাহ লিখেছিলেন। এটিও আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। মদীনা তাইয়েবের মাহমুদিয়া পাঠাগারে এই মুকাদ্দামার ছয়টি শরাহ বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও এর একটি শরাহ রয়েছে।

হযরত মওলানা আবদুস সালাম বাস্তবী সাহেব উর্দু ভাষায় এই মুকাদ্দামার তরজমা করেছেন। এতে মূলের জটিলতাকে তিনি যথাসম্ভব দূর করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাই একে আক্ষরিক তরজমা বললে হয়তো ভুল করা হবে। এটা আসলে তার বিশদ ব্যাখ্যা। এর নাম 'কাশফুল মুলহিম'।

ইফাবা— ২০০৩-২০০৪ — প্র/১৫০৩/(উ) — ৫২৫০

http://islaminonesite.wordpress.com